আজকের কাগজ

তারিখ 06 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাশের দায়িত্ব!

মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক লাশ পড়েছিলো সে লাশের দায়িত্ব ছিলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এবং তার দোসর রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস গোষ্টাপোদের। আশা ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে লাশ পড়া বন্ধ হবে কিন্তু তা হয়নি। পাঠকবৃন্দ, সত্তরের দশকে মহসিন হল এবং জগন্নাথ-শামসুন্নাহার হলের মধ্যবর্তী স্থানের নৃশংস হত্যাকান্ডের কথা স্মরণ করুন। মহসিন হল হত্যাকান্ডের আসামীদের বিচার ও শাস্তি হয়েছিলো কিন্তু তারা পরে মুক্তি পায় অর্থাৎ স্বাধীনতার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা রেহাই পেয়ে যায়। আরো পরে তারা রাজনৈতিক দল গঠন এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও দেশপ্রেমের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে। যে দেশে খুনীদের কাছ থেকে দেশপ্রেমের পাঠ নিতে হয় সে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের কথা সহজেই অনুমেয়। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের স্বঘোষিত হত্যাকারীদের তো বিচার পর্যন্ত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আশির দশকে স্বৈরশাসনামলে, এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র অঙ্গ সংগঠনগুলো সন্ত্রাসীদের লালন-পালন ও পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাস প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে থাকে। যদিও এরশাদ আমলে জাতীয় পার্টির কোনো আনুষ্ঠানিক অঙ্গ ছাত্র সংগঠন ছিলো না কিন্তু সব দলের সন্ত্রাসীদের মধ্যেই তাদের দালাল ছিলো। ফলে কখন যে কোন ছাত্র সংগঠনের কোন সন্ত্রাসী কার আদেশে কার কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সন্ত্রাসী তৎপরতায় নিয়োজিত হতো তা বাইরে থেকে বোঝা যেতো না। আশা করা গিয়েছিলো দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঐ সব সন্ত্রাসীদের আখড়ামুক্ত হবে। কিন্তু চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মৌলবাদী সন্ত্রাসচক্রের দখলে চলে গেলো। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে ক্ষমতাসীন ও প্রধান বিরোধীদলের এবং পরে উভয় দলের অঙ্গ সংগঠনের আন্তঃদলীয় এবং অন্তর্দলীয় রক্তাক্ত সংঘাতের শিকার হলো।

কয়েক মাস আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার ও প্রধান বিরোধীদলের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনের সংঘাতে বেশ কয়েকটি লাশ পড়েছিলো। তারপর শুরু হয় প্রধান বিরোধীদলের ছাত্র সংগঠনের অন্তর্দলীয় সংঘাত, তাতেও লাশ পড়ে, সে সংঘাত শেষ হতে না হতেই ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনের অন্তর্দলীয় সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে। গত ৩০ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে ঐ সংঘাতে এক নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, একজনের লাশ পড়ে, তাকে পাগল বলে ঘটনাটা উড়িয়ে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ ঘটনাকে 'অস্বচ্ছ' এবং উপাচার্য 'নস্যি' বলে উড়িয়ে দিয়ে যথারীতি এমএ পরীক্ষা শুরু করান এবং বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখেন। কিন্তু ঘটনাটির গুরুত্ব বোঝা যায় যখন প্রধানমন্ত্রী নির্জোট সম্মেলনে যাবার আগে চরম ব্যস্ততার মধ্যেও দলীয় ছাত্রনেতাদের ডেকে নিয়ে সংযত থাকার কঠোর নির্দেশ দিয়ে যান। ফলে পরের দিন আত্মঘাতী সংঘাতে রত ছাত্রনেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐক্যবদ্ধ শোভাযাত্রা বের করে। ঐ সময় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংঘাতগ্রস্ত ছাত্র সংগঠন ৩০ আগস্টের ঘটনাকে পরীক্ষা বানচালের প্রয়াস অভিহিত করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।

—কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার পূর্বেই গত ৪ সেপ্টেম্বর শেষ রাতে সূর্যসেন- মহসিন হলে যে মর্মান্তিক রক্তাক্ত ঘটনা ঘটে গেলো তা যে ৩০ আগস্টেরই জের তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সূর্যসেন হলের ঘটনার খবর ৪ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে ঢাকায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে, বিদেশী বেতারে যথাসময়ে ঐ খবর যথারীতি প্রচারিত হয় কিন্তু দেশের সরকারি প্রচার মাধ্যমে ঐ সংবাদ চাপা দেয়া হয়। বেতার ও টেলিভিশনে ৪ সেপ্টেম্বর রাতে শেষ সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করে 'অস্বস্তিকর' পরিস্থিতির কারণে দু'দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত রাখার সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ দিন সূর্যসেন-মহসিন হলে যে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটে গেলো সে সংবাদ বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয়নি যদিও পরের দিন সকালে প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের প্রধান খবর ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ রক্তাক্ত ঘটনা।

৪ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এতো গোলাগুলি হলো, একাধিক লাশ পড়লো, অনেক রক্ত ঝরলো আর সেই দিনই বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বিভিন্ন নেতারা যে বক্তব্য রাখেন তা-ও কম বিস্ময়কর নয়, তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এক সভায় বলেন, 'যে দলের ওপর আল্লাহর রহমত আছে, সে দলে সন্ত্রাসী থাকতে পারে না। বিএনপিতে সন্ত্রাসী থেকে থাকলে তারা নিজেরা গোলাগুলি করে শেষ হয়ে যাবে।' তথ্যমন্ত্রীর ঐ বক্তব্য যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, সন্ত্রাসীরা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় নির্মূল হবে? সে জন্যে সরকার বিশেষত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, মহানগর পুলিশ কর্তৃপক্ষ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনো দায়িত্ব বা করণীয় নেই? একই দিন এক সভায় গণতান্ত্রিক ফোরাম দলের নেতা ডঃ কামাল হোসেন 'সন্ত্রাস বন্ধে সংসদে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহবান জানান।' কিছুদিন পূর্বে তিনি বলেছিলেন, 'সন্ত্রাস দমন করতে না পারলে সন্ত্রাস এই সংসদকেই ধ্বংস করবে।'

সংসদের কাজ আইন প্রণয়ন ও বাজেট অনুমোদন, সংসদে এবং সংসদীয় কমিটিতে অবশ্য সন্ত্রাস সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয় কিন্তু সংসদ কিভাবে সরাসরি সন্ত্রাস দমনে সক্ষম তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। জামাতে ইসলামী নেতা কামারুজ্জামান বলেন, 'দুই নেত্রী চাহিলে এক সপ্তাহের মধ্যে সারাদেশের সন্ত্রাস বন্ধ হইতে পারে।' তিনি অবশ্য বলেননি যে, দুই নেত্রী চাইলেও চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস বন্ধ হতে পারে কি-না।

কয়েকদিন পূর্বে যোগাযোগ মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ চট্টগ্রামের এক সভায় অভিযোগ করে বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলোর কারণেই দেশ আজ সন্ত্রাসের কবলে নিমজ্জিত। কারণ সকল দলই সন্ত্রাসীদের লালন করিতেছে। সন্ত্রাসীদের কোনো ধর্ম নাই। তাহারা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে আশ্রয় নেয়।' আমাদের প্রশ্ন, জেনে-শুনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয় কেন? আগস্ট অপারেশনে প্রায় পঁচিশ হাজার সন্ত্রাসী গ্রেফতারের পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে এমন ব্যাপক সশস্ত্র রক্তাক্ত সন্ত্রাসের শিকার হয়? প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পরেও সন্ত্রাসীদের তৎপরতা এমন ভয়াবহ রূপ লাভ করে কিভাবে? এর প্রতিকারের কি কোনো পথ নেই?

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্জোট সম্মেলন থেকে ফিরে এসে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সরকারের স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তাক্ত সন্ত্রাস সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন দেশবাসী তা দেখার জন্যে গভীর-আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে।